লণ্ডন ছেড়েচি মাত্র দিন তিনেক। খুব অল্প সময় বটে, মনে হয় কিন্তু বহুকাল হোল। কাজের তাড়ায় জার্ম্মাণিতে এসে পড়েছিলুম। আড্ডা এখন ফ্রিড্রিস্ট্রাসের এক আফিসে। মনটা যখন হাঁপিয়ে ওঠে কাজের চাপে, তখন একটু স্বস্তির নিশ্বাস পেলেই মনে জেগে ওঠে যত রাজ্যের পুরোণো কথা। ফরাসী

দেশের কোন বিখ্যাত গন্ধের মৃদু আমেজের মত আমার মনে তখন পূর্ব্বের স্মৃতি-গন্ধ নিবিড় হ'য়ে ওঠে। আমি ভাবি সেই সহজ সুন্দর রুষ মেয়েটীর কথা।—আমার 'সোন্‌য়া'!—আজ আমায় এই নামের মোহ পেয়ে বসেছে। হোটেলের নিভৃত ঘরে ব'সে এই বিদেশিনীর কথা ভাবি—আমার মধ্যে সে তাকে মিলিয়ে নিতে চায়—কাল'য় সাদায় কি কখনও মেলে? সোনিয়া যেন সোনা, তাতে কলাই করার বিপদ আছে—চটা উঠে নষ্ট হ'য়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সম্পূর্ণ। আচ্ছা এখনও কেন সোনিয়ার কোন খবর নেই? সে তো নিজে থেকেই কত কী বলেছিল! আসবার সময়.. কত অভিনয়ই করেছিল। আর আজও এক লাইন লিখ্‌তে পারল না? জগতটা দেখ্‌ছি নিতান্তই বন্ধুহীন!

অলকার কথা মনে পড়ে এই সময়, বেশ বেশী কোরেই—তার মায়াময় চাউনির জালে জড়িয়েছি কয়েক বছর থেকে··যখন সে ছিল পোষ্ট গ্রাজুয়েটের ছাত্রী। দৃঢ় ওষ্ঠতলে যে আত্মনির্ভরতার অদম্য তেজ ছিল তা' আমার কাছে হার মেনেছিল, আমিও

হেরেছিলুম। এখন ভাবি, সে কি আমায় সকল দিক দিয়ে ঠকিয়ে গেল? তার হাতে লেখা কবিতা, তার মনের হাসি-কান্নার ঢেউ যে কাগজে লিপিবদ্ধ ছিল, তারই বোঝা ব'য়ে বেড়িয়েছি ও তাতেই ছিলাম খুসী। আজ তার থেকেও অব্যাহতি। বুলার কৃপায় একরকম সম্পূর্ণভাবে নিঃস্ব হওয়াটা কেমন লাগে, তা উপলব্ধি করার সুযোগ পাওয়া গেছে।

খুব একচোট ফাঁকা হাসি হেসে নেওয়া গেল মনে মনে। কিসের জন্যে··কোথায় কি ভাবে যে মানুষ ছোটে! আমি হাসি— আরে, আমি না দুর্জ্জয়! সোনিয়ার কাছে যদিও নিজে শুধু 'জয়' টাই বজায় রেখেছি, তবু··সেই দূরের স্মৃতির ইঙ্গিত আমায় ইসারা কোরে ডাকে? কেন? 'বিয়ার হাউসে'র দিকে বেরিয়ে পড়লুম।·· আনমনে চলেছি। কিছুরই টান নেই বাধাও তো নেই কিছুর। পার্কের ধারে একটা 'কাফেতে' ঢুকে পড়লুম। চারিদিকে ফুলের জোয়ার আর খুসির ঢেউ বইছে। এ জাতটা প্রাণ-খোলা হাসতে পারে··এদের জীবনযাত্রার ধরণেও বেশ হৃদ্যতা আছে ·অতি কচ্‌লানো তেতো ভাবটার অভাব

এখানে যথেষ্ট। এক ডাবব বিয়ার নিযে ব'সে পডলুম না ভেবেই এক চুমুক দিলুম 'যেন 'চিরেতা'র জল খাচ্ছি, হরি হরি! সাম্নেব দিকে চোখ্ পডলো। দেখি একটী বেশ চট্পটে জার্ম্মান ছোক্রা আর একটী তারই সমবযসী তরুণী আমায লক্ষ্য কোরে কি যেন বলছে। আমি চাইতেই তাদের দিকে, ছোক্রাটী উঠে এগিয়ে এল আমার সাম্নে—প্রশ্ন কবলে 'হ্যালো, আপনার দেশ?'

ছোক্রাটীকে এক ঝলক বেশ কোরে দেখে নিলুম। বয়স সাতাশ—আটাশ, নীল চোখে রাজ্যের দুরুহ প্রশ্ন ও কৌতূহল। ছোক্রাটীর সর্ব্বাঙ্গে চঞ্চলতা আর অসহিষ্ণুভাব যে কোন সময়েই যে কোন কাজে লাফিয়ে পড়ার শক্তি ও ইচ্ছা এর পুরো মাত্রায় বর্ত্তমান।

'হিন্দুস্থান থেকে আস্ছি। ফিল্মের কাজে আছি লণ্ডনে··তবে কবে যে কোথায় থাকি স্থিরতা নেই। আপনি কি করেন? নাম?' তার ভাষা জার্ম্মানেই কথা বললুম—

ছোক্‌রা বললে 'আমি পাইলট্‌ (উড়িয়ে) নাম ম্যায়ার—আর ইনি (মেয়েটীকে লক্ষ্য ক'রে) আমার প্রদেশেরই এক পরিচিতা মেয়ে··মিউনিকের ছাত্রী। বেড়াতে এসেছেন এখানে।'

'জেল্‌মা' উঠে এল। আমি চেয়ারটা দিলুম এগিয়ে। বললুম 'বসুন, আপনার বন্ধুর সঙ্গে আলাপ কর্‌ছি।'

মেয়েটী বল্‌লো 'আমাদের ভাষা জানেন দেখ্‌ছি। কতদিন আছেন এখানে?'

বললাম 'মাত্র তিনদিন। আগে শেখা ছিল।'

'আপনারা ভারী চমৎকার লোক। আপনাদের কথা আমি পড়েছি। আপনাদের দেশে যেতে খুব ইচ্ছে হয়। আমার বাড়ী জানেন? Beyreuth এ·· 'ওবেরামারগাউ'য়ের কথা শুনেছেন? টাউবেরের নাম?··

ক্রাইষ্টের পার্ট প্লে করেছিল, অপূর্ব্ব !' ··· ছোকরাটী তার কথার ওপর কথা ক'য়ে উঠ্‌লো। বলে উঠ্‌লো, 'হের্ (মিষ্টারের বদলে) জয়, আপনার হিন্দুস্থানের মেয়েদের কেমন দেখ্‌তে ? আচ্ছা, তারা নাকি ঘরের বাইরে বেরুতে পারে না ?' জেল্‌মা হেসে যেল্‌লো, বল্‌লে 'তোমার কি তাতে ?'

আমি মনের ভেতর ক'সে মেজে উত্তরগুলো তৈরী কোরে নিচ্ছি। জেল্‌মা ব'লে উঠলো 'আচ্ছা হের্ জয়, আপনাদের দেশে 'ফ্লাইং' হয় ? আপনার 'ফ্লাই' করার ইচ্ছে হয় না ?'

এতগুলো প্রশ্নের ব্যাটারির কাছে দাঁড়ানো শক্ত। ম্যায়ার ও জেল্‌মা যেন জীবন্ত প্রশ্ন। তাদের সঙ্গে অনেক আলাপ হোলো। ম্যায়ারের সঙ্গেই কথা হয় বেশী। জেল্‌মা মাঝে মাঝে উৎসাহের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দেয়··তার চোখে যেন বিদ্যুৎ খেল্‌ছে, তা ঝল্‌সায় না, ধাঁধিয়ে দেয়।

বার্লিনের ওপরটা একবার উড়ে দেখবার জন্যে ম্যায়ার আমায় নেমন্তন্ন ক'রলে।

চারদিনের দিন, সোনিয়ার চিঠি পেলুম—লণ্ডন থেকে। ছোট চিঠিতে অনেক খবর,—এক ফোঁটা এসেন্সের মত। সে লিখেছে অশুদ্ধ ইংরাজীতে—

*　　*　　*

"জয়, তোমার ব্যাপার কি ? ক দিন মাত্র তো, তাও তোমায় ছেড়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। তোমার

দরজার কাছে ক্যানারি পাখীটা ডেকে ডেকে সারা হোল। তোমার সেই ভারতীয় বন্ধু একজন হিন্দু তরুণীকে সঙ্গে করে' তোমার সন্ধানে এসেছিল। মেয়েটীর চোখ দুটী খুব টানা, তার চাউনিতে আকাশের গভীরতা, আর মাথায় কালো চুল একরাশ। তাকে তুমি চেনো না কি?—দেখ জয়, আমার চুল রাঙ্গা, আমার চোখ অত টানা নয়,—তোমার কি ভাল লাগে না? আমি এম্‌বেসির দৌলতে আস্‌ছে সপ্তায় প্যারিসে যাচ্ছি উড়ে। তোমাকে দেখতে চাই ব'লেই ভারটা নিলুম—এসো নিশ্চয। বাবার চিঠি পেয়েছি। ভিয়েনায় নেমন্তন্ন করেছেন তোমায়। ভুলো না জয়! প্যারিসে যেন দেখা পাই—

তোমার বিদেশিনী 'সোনা'

* * *

ম্যায়ারের সঙ্গে কথা ছিল আজ বার্লিনে উড়ো জাহাজের আড্ডাখানার মাঠ টেম্পলহয়েফ এ যাওয়ার। সে সব গুলিয়ে যাবার যোগাড় হল সোনিয়ার চিঠি পেয়ে। তার চিঠিতে কথিত ঐ যে বান্ধবী, সে যে

অলকা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তার ওপর সোনিয়ার দেখছি নজর পড়েছে—মেয়েরা কি হিংসুক! বেশ হয়েছে! এতদিন পরে মনটা একটু খুসী হোল—আর এ একা নয়। কিন্তু বুলার অলকার সঙ্গে হঠাৎ আমার উদ্দেশে আসবার কারণ কি? ঝগড়া করার মতলব! কে জানে? না, বেরিয়ে পড়া যাক্‌··

টেম্পল্‌হয়েফ-এ গিয়ে দেখি চারিদিকে ওড়বার ধূম পড়ে গেছে। এরোড্রোমের রেস্তরাঁর বারাণ্ডার কাছেই জেল্‌মা আমাকে সাদর অভ্যর্থনা করে একটা টেবিলে নিয়ে গিয়ে বসাল। শুনলাম ম্যায়ার একখানা 'ক্লেম' মেশিনে সবে ওপরে উঠেছে। Templehof—আশ্চর্য্য এই উড়োজাহাজের আড্ডাখানা! এখানকার আকাশ সর্ব্বদাই শব্দ-মুখর হ'য়ে থাকে· ইঞ্জিন, প্রপেলারের তাল, ছন্দ বজায় রেখে নেচে চলার যে গান, তার সুরের সমঝদার মাত্র এই বিমানবীরেরা। সমস্ত এরোড্রোমটার ওপর দিয়ে এই যে সুরের ঢেউ ব'য়ে যাচ্ছে,

প্রত্যেক 'উড়িয়ে'র মনের তারে তা' আঘাত করে কোথাও বেসুরো বাজবার যো-টী নেই। প্রপেলারের ঘূর্ণী আমার শরীরে এক অপূর্ব্ব উত্তেজনার সৃষ্টি কোরলে এখানে এসে মরণের সঙ্গে খেলা কোরে বেড়ান'র জাত—এই বৈমানিকদের জীবনটার অভিনবত্বটুকুর সন্ধান পেলুম। কবে তার আস্বাদ পাবো তারই ভাবনায় পড়া গেল।

সোনালী চুলের গোছা দুলিয়ে জেল্‌মা এবার জিগ্যেস করলে 'হেব্ জয়, আপনি তা হ'লে ফ্লাইং শিখচেন।'

উত্তর দিলুম 'ভেবে দেখি। অবিশ্যি আমার আপত্তি নেই। তবে অন্য কারুর তো থাব্‌তে পারে।'

জেল্‌মা ঈষৎ হেসে বল্‌লে 'কার? আপনি বিবাহিত? না, প্রেমে পড়েছেন? আর তাতে আপত্তিই বা কি?'

বললুম 'এর কোনটাই আমার মৃত্যুর সঙ্গে খেলা করার সঙ্গী হবার পথের বাধা নয় বাধা

হ'চ্ছে, বুড়ী মা। আমার কাকারা তো এ কাজ নিলে খুসীই হবেন··ভাববেন আমার আসল সময় বেশ ঘনিয়ে এসেছে। মা যে শুন্‌বে না!'

···'আপনার কি আর কেউ নেই?' জেল্‌মার চোখ দুটীর ওপর দৃষ্টি রেখে বললুম 'না, ছিল একজন সে সরে গেছে।' জেল্‌মা বুঝেও যেন বুঝলে না, চেয়েছিল জিজ্ঞাসুনেত্রে। বললুম তাই, 'প্রেমের কথা কইছিলে না? এই আকস্মিক দুর্ঘটনা, আমার জীবনে ঘ'টেই তো আজ তোমাদের কাছ পর্য্যন্ত ঠেলে এনেছে। জান জেল্‌মা, আমার আর ফেরার পথ নেই। ভাবি কি জান, রাতের ঘনীভূত অন্ধকারে নর-নারী যদি পরস্পরকে চুম্বন বিনিময় কোরে দিনের আলোয় বিস্মৃত হ'তে পারে, তার চেয়ে কি বিস্ময়ের কিছু আছে? তবে এই সুদূর বিদেশে এসে এ ধারণার উভয় দিকই দেখ্‌ছি। সময় হোলে, বল্‌বো একদিন সে কথা। প্রেমাস্পদকে ছাড়তে আমায় হ'য়েছে বটে, তাতে দুঃখ নেই। কিন্তু এই যে জগতে আমায় বাস করতে হ'চ্ছে, তার রোমাঞ্চকর বৈচিত্র্য আর কোনদিন আমার চোখে স্বপ্নের মায়া-কাজল আঁকতে পারবে না।'

জেল্‌মা স্তব্ধ হ'য়ে আমার কথাগুলো শুন্‌ছিল। আমি থাম্‌তেও হঠাৎ সে কিছু কইতে পারলে না। শুধু বল্‌লে 'হের্‌ জয়, আপনার 'কাহিনী একদিন শুন্‌তেই হ'চ্ছে। কথাগুলো ভারী অদ্ভুত বলেন আপনি। ম্যায়ার হাসিমুখে এই সময় আমাদের পাশে এসে বস্‌লো। তার উজ্জ্বল মুখে বিশ্বভোলা আনন্দ। এত আনন্দ এরা পায় কোথা থেকে ?

আমরা সবাই মিলে চা খাচ্চি, ম্যায়ারের দৃষ্টি কিন্তু রয়েছে আকাশের দিকে। অন্য সব বিমানবিহারীরা এক এক প্লেনে ওঠা-নামা করছে ক্ষিপ্রগতিতে। চারদিকে কর্ম্মপ্রেরণার সাড়া পড়ে গেছে। রৌদ্রের প্রখরতাও বেড়ে চলেছে, শীতের আমেজ ও কেটে আসছিল। আমি ম্যায়ারের হাতে হাত রেখে বললাম, 'দেখ, আমি তোমার ছাত্র হবো' আমি ফ্লাইং শিখবই।

সানন্দে সে আমার পিঠে এক ঘুসি মেরে বল্‌লে, 'বহুৎ আচ্ছা। এই ত চাই।'

~রায়

জেল্‌মা এবার একটু অন্য রকম হাসি হাসলে। পরে বল্‌লে 'ম্যায়ারের তাহ'লে দুজন ছাত্র হলো আজ। দেখা যাক্, কার ওপর তার দরদ বেশী।'

ম্যায়ার হো হো করে হেসে উত্তর দিলে, 'দেখচেন হেব্, মেয়েদের 'জেলসি' ? '

এয়ারোড্রোমের এই খোলা মাঠে প্রাণ খোলা আজ হাসি হাসতে পারলুম অনেক দিন পরে।

একশ'উনসত্তর

সোনিযার আহ্বান এড়িযে চলা অসম্ভব। সোনিযা দেখছি সত্যিই মরে, আমায ভালবেসে ফেলে। প্যারিসে যাবার জন্যে তৈবি হতে লাগলুম—

"বঁধুর দিঠি মধুর হযে আছে
সেই অজানার দেশে"—

—রায়

·· প্যারিসে এসে পৌঁছুলুম যখন তখন বিকেল হয়ে গেছে। একেবারে ষ্টেশনের হোটেলে লাঞ্চ শেষ করে এয়ারোড্রোমে গিয়ে হাজির হলুম। যেখানেই যাই ভাষার বিভ্রাট আমায় বিভ্রান্ত ক'রে তোলে। তেষ্টার জল চাইতে গিয়ে 'ভাসেব্' কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল, তখনও জার্ম্মানীর আমেজ মাথা থেকে কাটেনি। ওয়েটার-পুঙ্গবও এক গ্লাস 'ভিচি ওয়াটার' এনে হাজির। কি বিপদ! —'অ' (eau) কথাটা ভুলেই গিছলুম, নিগ্রহের একশেষ। কোনরকমে 'আকারৈরিঙ্গিতৈর্গত্যা' কাজ সেরে চলেছি ফাঁকি দিয়ে। মনে হয়, ভাষার পার্থক্য ভগবানেরই কারসাজি, সব দেশের লোকেই যদি এক ভাষায় কথা কইত, মানুষের মধ্যে রেষারিষি ও গণ্ডগোল তা'হলে বেড়ে যেত বেজায়। ভাষার ব্যবধান মানুষকে রক্ষা করেছে অনেক বিপদ থেকে।

নক্ষত্রবিদ্ যেমন উঁচুমুখে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে, আমিও এয়ারোড্রোমে গিয়ে বিরাট্ বিমান জগতের দিকে চেয়ে আছি সোনিয়ার প্লেনের প্রত্যাশায়। আজ মনে হচ্ছে, আশায় বেঁচে থাকা কি সুখের। সেটা বোঝা

যায় তখন, যখন জানি যে আমার জন্যে আর একজন ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসছে দূর—দূরান্তর থেকে। সেই জানার মধ্যে কি অপূর্ব্ব সুখ, কি অসম্ভব তৃপ্তি! যাকে চাই, তাকে পেলে যতখানি তৃপ্তি, তা বোধ স্থায়ী হয় না অনেকক্ষণ, কিন্তু পাওয়া না পাওয়ার মধ্যে দিয়ে আশার আনন্দে যতক্ষণ কাটে ততক্ষণই মধুর।

এয়ারোড্রোমে হঠাৎ একটা নিদারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'লো। ক্রেফ কর্ত্তারা দেখি সব ছুটোছুটি জুড়ে দিয়েছে। চারিদিকেই উত্তেজনা। ব্যাপার কি? দেখলুম সকলেই ছুটে চলেছে 'ওয়ারলেসের' কামরার দিকে। পরক্ষণেই দু'খানা মোটরে বোঝাই হ'য়ে অফিসারেরা ছুটে বেরিয়ে পড়ল সহরের পথে। জিগ্যেস করি একজনকে 'ব্যাপার কি?' শুনি একখানি লণ্ডনের আরোহী-শুদ্ধ মেল-প্লেন যন্ত্রবিভ্রাটে কাছেই পাঁচ ছ' মাইল দূরে এক গাঁয়ে ভেঙ্গে পড়েছে।

আমাব মাথার ভেতর রক্ত চন্ মন্ ক'রে উঠল। ভাববার ক্ষমতা প্রায় শেষ হয়েই এসেছিল।

আকাশের ধূসর রং চারদিকে ফুটে উঠল।····এ কি সোনিয়ার প্লেন ?

ওয়ারলেশ্ আফিসের ঘরে অসম্ভব ভিড। সেখানে একজন অফিসাব দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভাঙ্গা ইংরাজীতে জানালেন যে একখানি প্লেন প্যাসেঞ্জার ও মেল নিয়ে লণ্ডন থেকে প্যারিসে আসবার পথে পাঁচ ছ' মাইল দূরে এঞ্জিনের গোলমালে ভেঙ্গে পড়েছে। যেখানে এই দারুণ বিভীষিকা ঘটেছে সেটা এক ছোট গ্রাম। পাইলট্ প্রাণ দিয়েছে প্লেনখানিকে বাঁচাতে গিয়ে। ·· জিগ্যেস করি সে প্লেনে কোন মেয়ে ছিল কি?—'সোনিযা' নাম ? হাঁ তিনটী মেয়ে ছিল, দু'জন মৃতকল্প অবস্থায়, নাম এখনও পাওয়া যায়নি। গাঁয়ের কাছেই একটী ছোট হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঠিকানা ?—বলেই দিলেন -

তিনখানা ট্যাক্সি বোঝাই হয়ে আমরা ভয়সঙ্কুল মনে ছুটে চললুম হাঁসপাতালের দিকে। কারো মুখে কোন কথা নেই। একজন ফরাসী বুড়ি প্রায়

অর্দ্ধ অচেতনভাবে আমাদের গাড়ীতে উঠল, আর দুজন প্রৌঢা মেয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে। হাঁসপাতালের দরজার কাছে এসে আমাদেব টাক্সি দাঁড়াল। গাঁয়ের লোকে ভিড় কোরে আছে খুব, আমার তখনও মাথার ঠিক ছিল না। রাস্তার ওপর সারি সারি খাট। নার্সেরা নির্ব্বাকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনটী মেযে-আরোহীকে আলাদা ঘরে রাখা হয়েছে—জানলুম, সোনিয়া তাদের মধ্যে একজন।

বিদেশী আমি, ঘরের কাছে এগিয়ে যেতে বিশেষ আপত্তি হোল না। একজন ডাক্তার আমার কথাবার্ত্তা শুনে সাদবে একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। হাঁ এই ঘবেই বোধ হয সোনিযা আছেন। এক মিনিট মঁশিযে,'' একটী হার্ট ইন্‌জেক্‌সন্ দেওয়া হচ্ছে, এক মিনিট—। আপনি তাঁব কে ?' নির্ব্বাক হ'যে গেছি তখন—আর কেউ তাই প্রশ্ন করলে না। নার্সটী বেরিয়ে এসে বল্‌লে, মহিলাটীর নাম আমরা জানতে পেরেছি তাঁর লাগেজ থেকে—সোনিয়া আঁদ্রেযিভনা। এইমাত্র জ্ঞান হযেছিল, খুব সামান্য। তিনি চোখও চেযেছিলেন একটু আগে, অতি কষ্টে একবার ডেকেছিলেন 'জোয়া' বলে—'

আর অপেক্ষা কোরতে পারলুম না। ছুটে সেই ঘরটার ভেতর চলে এলুম। সাম্‌নেই চাঁদের মত পাণ্ডুর মুখে মরণের কালিমা দ্রুত নেমে আসছে ছায়ার মত। ভেতর থেকে একটা দারুণ টান উঠছে জীবনের শেষ বায়ু বেরিয়ে যাবার প্রবল চেষ্টায়। আমি তার হাতখানি নিয়ে আমার বুকের ওপর রাখলাম, তার মৃত্যু-বিবর্ণ ওষ্ঠযুগলে দীর্ঘ চুম্বন করার প্রচণ্ড ইচ্ছা হোল। তার মুখের ওপর থেকে ভিজে ভিজে চুলগুলি সরিয়ে দিলাম। দু'গাল বেয়ে আমার ঝর ঝর কোরে জল পড়তে লাগল। যে নার্স টী মাথায় আইস্-ব্যাগ দিচ্ছে, সেও আর এ দৃশ্য সহ্য করতে পারলনা, উঠে গেল খোলা জানলার কাছে, চেয়ে রইল সুদূর মাঠের পানে।

আমার সোনিয়া আমার কাছেই এসেছে—কিন্তু তার সেই ঝরণা-ভেঙ্গে-পড়া হাসি কই? তার মুখের বাণী কই? তার সেই উচ্ছ্বসিত আলাপ কই? বহু দূরের যাত্রী সে, এখনো তাকে অনেক দূর যেতে হবে আমি তার হিম-শীতল কপালে হাত রেখে কতক্ষণ বসেছিলাম জানিনা। সন্ধ্যার মসীজাল সাদা ঘরে ঢুকে এলো চোরের মত

ধীরে ধীরে। মাথার কাছে একটী ক্ষীণ ইলেকট্রিক আলো জ্বলে উঠল, সে যেন বলতে এলো—'ওগো শ্রান্ত দূর পথের যাত্রি, ভয় কি? এই ত এসেছি তোমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে, এসো আমাব হাত ধরো। পিছনে চেয়োনা আব, এই দেখ সামনের রাস্তা—এ পথ চলে গেছে মৃত্যুহীনের রাজ্যে, সেখানে তোমার জন্যে আছে বাগানভরা ফুল, শাখাভরা পাখী।'

নার্স আমায় হাত ধরে' বাইরে নিয়ে যেতে চায়। তার কাছ থেকে মনের মানসীকে আমার শেষ চুম্বন করার অনুমতি নিই—বরফের মত ঠাণ্ডা ঠোঁটদুটী 'সোনা'র, ভেতরটাকে আমার জ্বালিয়ে দিল। আর চাইতে পারলুম না, ত্রস্তভাবে মুখখানি ফিরিয়ে নিলুম সে মুখ কিন্তু আমার চোখের সামনেব পর্দ্দায় কাঁপছিল।··সোনা,··তোমায় যে এখন অনেক দূর যেতে হবে, একলা, জ্ঞাতিহীন, বন্ধুহীন নির্ব্বান্ধবেব দেশে। নার্স, জানলা খুলে দাও সব। আকাশেব নীল আলো আসতে দাও, সাঁঝের বাতাস আসতে দাও, তারাগুলো আমার 'সোনা'র সুন্দর মুখখানি চিনে রাখুক।

—রায়

নার্স আমার কথা রেখেছিল। সাদা আস্তরণে আকণ্ঠ আবৃত করে' সে আমায় বাইরে নিয়ে এল। সেখানে একখানি চেয়ারে আমি মাতালের মত বসে পড়লুম। আর আমার বুকের ভেতর থেকে কান্না আসছে না, চোখ ফেটে জল বেরুচ্চে না, আমি কেবলই ভাবছি,—এ কি! এর মাঝে কি কোন অজানা শক্তির কারসাজি আছে? আমার সংযম হার মানলো আমার বুদ্ধিশক্তি লোপ পেয়েছে, আমি অঝোরে কেঁদে ফেললুম। নার্স বললে, 'এ কি মঁসিয়ে? আপনি না পুরুষ মানুষ?'

সোনিয়ার 'আটা-শে'র ভেতর থেকে পাওয়া গেল দুখানা চিঠি। একখানা তার বুড়ো বাপকে লেখা আর একখানা আমার উদ্দেশে অলকার চিঠি। সোনিয়া তার বাপকে আমার প্রতি ভালবাসার কথা জানিয়ে লিখেছে যে তার মন এক ভারতীয় হিন্দু চুরি কোরেছে·· তিনি যেন ফিরে পাবার চেষ্টা না করেন? ছোট্ট মিনতিভরা চিঠিখানি!····

~রায়

অলকার চিরকুটটিও পেলুম—পণ্ডিতিভাব। আমি যেন বিবাহ করে সুখী হই, আর যেন ভবঘুরের মত তার পিছনে না ছুটি। তার জীবনের গতি আলাদা। সে তার অপরিপক্ক মনকে ঠিক বুঝতে পারেনি। আমায় সে বন্ধুভাবে নিতে পারে, প্রণয়ীভাবে নয়। তারপর পুরুতের মত খানিকটা লেকচার··চিঠিখানা টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে পথের ধূলায় লুটিয়ে দিলুম।

সোনিয়ার ভাই লিওনিড গ্লাসগো থেকে পরদিন সকালেই এসে পৌঁছুল। সে যখন ব্যাপার সব জানলে, তখন পাগলের মত কাঁদতে লাগল। আমরা দুজনে সোনিয়ার শেষ কাজ সমাপ্ত ক'রে যখন হোটেলে ফিরে এলুম, তখন বিকেল হয়ে গেছে। লিওনিড বাপকে এত শীঘ্র খবর দিতে রাজী হ'লোনা।

বল্‌লে, 'দেখুন, মিষ্টার জয়, আর আমার কিছু ভাল লাগছেনা। সোনিয়া ছিল আমার বুকের রক্ত। দুজন ভাই-বোনে মিলে আমরা বছর দুই ইংলণ্ডে এসেছি। আমাদের দেখাশোনা হোত খুবই কম, কিন্তু আমার ছোট

বোন ব'লে তাকে কতখানি যে ভালবাসতুম, তা আপনাকে বোঝাতে পারবো না। আপনি কি ইংলণ্ডে আর ফিরচেন না?'

'না, লিওনিড্ আমি চিরকেলে ভবঘুরে! মুসাফির মন আমার। হয়ত সোনিয়াই একে বাঁধতে পারত—তার ভালবাসার বাঁধনে। আজ সে বাঁধনের দায় থেকে আমায় মুক্ত ক'রে সে চলে গেছে। আমার কাজ হবে এখন এগিয়ে চলা—মোহের ফেরে পড়ে যে পথের পথিক না হ'য়ে ও, সে পথহারা হয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলল—আজ হতে আমিও সে পথের পথিক।

লিওনিড্কে সন্ধ্যায় মেলট্রেণে তুলে দিলুম। তারপর পাড়ি দিলুম এরোপ্লেনের আড্ডাখানার পথে। রেলের চাকা অবিশ্রান্তগর্জ্জনে তখন ছুটে চলেছে, 'প্যুলমান কারে' আমি একা আরোহী। ধারাস্রাবী বৃষ্টির আঘাত পড়ছে কাচের জানলাগুলার ওপরে। আমি ভাবছি হরিশ খুড়োর কথা, মিনতির কথা, কাকাবাবুর কথা আর আমার

বুড়ী মা'র কথা। ম্যায়ারকে কথার ছলে বলেছিলুম, ফ্লাইং শিখবো—ঐ আমার 'সোনার' পথ! দুনিয়াশুদ্ধ আজ তামার চোখের কাছে ছায়ার মত ভেসে চলেছে,—আকাশে বজ্রের বিদ্যুৎ-বিকাশ, মনে উঠেছে ঝড়, মাথায় জেগেছে ঘূর্ণী। মন ভোলাবার ওষুধ আছে সঙ্গেই, সারা পথ সেই ওষুধে মনের যন্ত্রণাকে দাবিয়ে রেখেছি, হিংস্র পশুকে সার্কাস-প্রেয়ার যেমন ব্যাটারি-চার্জ্জে দাবিয়ে রাখে। অলকার চিঠির কথা হঠাৎ একবার মনে পড়ায় আনমনা অট্টহাসি হেসে উঠ্‌লুম - মুসাফির মন চম্‌কে ওঠে—

এ আবার কি দুঃস্বপ্ন!

সবশেষ~